আশুরা দর্শন

ইতহাসের ঊষালগ্ন থেকেই মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের কালজয়ী সংগ্রামের ধারাবাহিকতার চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ও জলন্ত নির্দশন হল আশুরা ও কারবালা। যা কেয়ামত পর্যন্ত অসত্যেও বিরুদ্ধে সত্যপন্থিদেও খোদাই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শক্তি সাহস ও অনুপ্রেরণা যোগাবে। এ অনুপ্রেরণার মধ্যে নিহিত রয়েছে ইসলামী ধ্যান–ধারণার একশেষ্ঠ আদর্শ।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহু আন্দোলন আন্দোলিত করেছে মানব সভ্যতাকে, পরিবর্তন ঘটিয়েছে সমাজ-সংস্কৃতিকে, কিন্তু স্থায়ীত্ব লাভ করতে পারিনি কোনটি। পরিণামে হয়েছে যাদু ঘরের বস্তু।অথচ ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর আন্দোলন ছিল এক অনন্যারুপী সংগ্রাম। যে সংগ্রামে ভাবমূতি কখনও ম্লান হয়নি বরং যুগে যুগে মুক্তিকামী জাতির সমাজ গঠনে নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা দিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। কারবালা এমরন এক মহাগ্রন্থ যার প্রতি পাতায় পাতায় রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিভিন্ন ক্ষেত্রের নির্দেশনা। কারবালায় রয়েছে, ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক, আরব ও অনারবের ভুমিকা, জিহাদ, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, ইবাদতের শিক্ষা, ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। রয়েছে প্রভু জন্য চরম ত্যাগ ও তিতিক্ষার নিদর্শন।

আজ আশুরার প্রকৃত ভাবমূর্তিকে বিকৃত করার গভীর চক্রান্ত চলছে। কখনও বন্ধুর বেশে নির্বোধভাবে অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে আবার কখনও শত্রুতা মূলক ভাবে আশুরার বিরূপ চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে সমাজে। অনেকে কারবালাকে শুধু শোক গ্রন্থেই পরিণত করেছে। আবার কেউ ইমামের বীরত্বকেই ব্যাখ্যা করেছেন। আবার অনেকে রাজনৈতিক রং লাগিয়ে সীমাবদ্ধ করেছেলে মহান আন্দোলনকে। এধরণের ব্যাখ্যার কোনটাই হয়ত ভুল নয়। তবে একক ভাবে কারবালার পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।

ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর আন্দোলন ও শাহাদত কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। বরং তা ছিল অত্যন্ত সুপরিকল্পিত একটি বিপব যার রূপরেখা প্রণয়ন করেছেন স্বয়ং হযরত মুহাম্ম (সঃ) ও তাঁর পূণ্যবান আহলে বাইতগণ।তাই এটিকে নিছক বিদ্রোহ এবং অপরিকল্পিত আন্দোলন যা ব্যর্থ হয়েছে বা মুসলিম উম্মাহর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলা মোটেও সমীচীন হবে না।

ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর আন্দোলন ছিল একটি ঐশী আধ্যাত্মিক আন্দোলন-ইসলাম ধর্মকে বিকৃতি, মুসলিম উম্মাহকে বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতা এবং মজলুমকে জালিমের হাম থেকে উদ্ধার করার আন্দোলন। সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যার মূলোৎপাটনের আন্দোলন ছিল ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর এ আন্দোলনের মুল উদ্দেশ্য। মোট কথা এটি একটি পূর্ণ আন্দোলন। কারণ এ আন্দোলনে ইসলামের পর্ণ বাস্তবায়ন প্রতিফলিত হয়েছে। একটি সফল ও আদর্শ আন্দোলনের সমুদয় দিক (ঐশী , আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক দিক এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের তাত্বিক দিকও) এ আন্দোলনে সন্নিবেশিত হয়েছে। আর তা হতেই হবে কারণ এ আন্দোলনের রূপকার মহান আলাহর রাসুল নিজে এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হুসাইন (আঃ)। মহানবী (সঃ) বিভিন্ন সময় তাঁর উম্মতকে এ আন্দোলন সম্পর্কে (কারবালার মহা হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন, সাবধান করেছেন যাতে তারা সত্য পক্ষ অবলম্বন করতে পারে এবং প্রহেলিকাময় প্রচার-প্রপাগান্ডার ধূম্রজালে আবদ্ধ হয়ে সত্য চিনতে ভুল না করে। তারা যেন সে সময় তাঁর প্রাণপ্রিয় দৌহিত্র ইমাম ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর সাথে থেকে বিচ্যুতির হাত থেকে রেহাই পায়।[১]

ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর আন্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে এর উপাদান গুলো বিবেচনায় আনা দরকার। ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর আন্দোলনে আমরা তিনটি মুল উপাদান দেখতে পাই ঃ

(১) বাইয়াত প্রসঙ্গ

(২) কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গ

(৩) সং কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ প্রসঙ্গ

(১) বাইয়াত প্রসঙ্গ ঃ

মুয়াবিয়া খলিফা হওয়ার পর প্রত্যক্ষ করে যে, সামাজিক শক্তি নবী পরিবারের হাতেই বহাল রয়েছে আর এটা বনু উমাইয়াদের গোষ্ঠিগত স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়। তাই মুয়াবিয়াই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে হযরত আলী (আঃ) -এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের ভিত্তি স্থাপন করে। তারই নির্দেশে মিম্বারে ও নামাজের খুদবায় হযরত আলী (আঃ)-কে অভিশাপ দেওয়ার প্রথা চালু হয়। একই সাথে হযরত আলী (আঃ)-এর অন্যতম সমর্থকদেরকে বেপরোয়া ভাবে হত্যা করা হয় এবং বানোয়াট অজুহাতে তাঁদেরকে বন্দী করা হত যাতে ইমাম আলী (আঃ)-এর ফজিলত সমূহ প্রচার করতে না পারে । শুধু তাই এমনকি অর্থ ব্যয় করে ইমাম আলী (আঃ) -এর উপলক্ষে বর্ণিত হাদীস সমূহ জাল করে উমাইয়া ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের পক্ষে বর্ণনা করা হয়।

মুয়াবিয়া যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংযোজিত কিছু বিদআত প্রথার সাথে আরো কয়েকটি নব্য প্রথার প্রচলন শুরু করা হয় । যেমন ঃ

(১) ইমাম আলী (আঃ)-কে অহরহ অভিশাপ দেয়া ।[২]

(২) টাকার বিনিময়ে ইমাম আলী (আঃ)-এর বিরুদ্ধে হাদীস জাল করা।

(৩) প্রথম বারের মত ইসলামী সমাজে বিনা দোষে হত্যাযজ্ঞ পরিচালনা করার অবাধ রীতির প্রচলন। এছাড়া সম্মানীয়দের সম্মান খর্ব করা এবং হাত-পা কেটে বিকলাঙ্গ করে দেয়া। মহানবী (সঃ)-এর কতিপয় সাহাবী যেমনঃ হুজুর বিন আদী, রুশাইদ হাজারী, আমর বিন হামিককে হত্যা করা।

(৪) বিষ প্রয়োগে হত্য করা। যেমনঃ পূর্বে ইমাম হাসান (আঃ)-কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[৩]

(৫) খেলাফতকে নিজের বংশে আবদ্ধ রেখে রাজতন্ত্র প্রথা চালু করা এবং ইয়াজিদের মত অযোগ্য ব্যক্তিকে খেলাফতের দায়িত্বভার অর্পন করা।

(৬) ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান লংঘন করে পিতা আবু সুফিয়ানের জারজ সন্তান জিয়াদ ইবনে আবিহিকে পিতার বৈধ ঔরসজাত সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়া এবং আপন ভ্রাতা বলে গ্রহণ ।[৪]

(৭) আলাহর নির্ধারিত হদ্দ বা শরীয়তের দন্ডবিধি প্রয়োগে বিরত থাকা। মাওয়ার্দী ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন ঃ মুয়াবিয়ার কাছে এক চোরকে ধওে আনা হলে মুয়াবিয়া চুরির অপরাধে তার হাত কাটতে চাইল। তখন চোরের মা বলল, ‘ হে আমীরুল মুমেনীন ! আমার ছেলের এ পাপটিকে আপনি আপনার ঐ সব পাপ ও গুনাহের অর্ন্তভুক্ত করে নিন যে গুলো সম্পর্কে আপনি পরে তওবা করে নিবেন।’ তখন মুয়াবিয় ঐ চোরটিকে ছেড়ে দেয়। [৫]

নিঃসন্দেহে মুয়াবিয়া দুশ্চরিত্র পুত্র ইয়াজিদকে খেলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনীত করার মাধ্যমে শুরাঈ পদ্ধতির ইসলামী খেলাফতকে বংশীয় রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত করেন। আর এটি ছিল ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর উপর আরোপিত অন্যতম অমার্জনীয় একটি জঘন্য অপরাধ। ইমাম হুসাইন (আঃ) -এ সকল বিদআতের মূলোৎপাটন করার জন্য নিজ সঙ্গী-সাথীসহ কারবালায় অত্যন্ত নির্মম ভাবে শাহাদত

বরণ করেন। ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করা প্রত্যাখান করে ইমাম হুসাইন (আঃ) মদীনার গর্ভণর অলীদ বিন উৎবার কাছে ইয়াজিদের জঘন্য চরিত্র উন্মোচিত করে বলে ছিলেন , 'নিঃসন্দেহে ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়া একজন দূর্নীতিপরায়ণ, মদ্যপ ব্যক্তি। সে সম্মানিত প্রাণের হত্যাকারী, প্রকাশ্যে কুকর্ম ও ব্যভিচারে লিপ্ত এক জঘন্য লম্পট তাই আমার মত কোন ব্যক্তি ইয়াজিদেও মত লোকের হাতে বাইয়াত করতে পারে না।' [৬]

মুনজির ইবনে জুবাইর বলেছেন, 'খোদার শপথ ,ইয়াজিদ মদ্য পানকারী। খোদার শপথ, নামাজ তরক করা পর্যন্ত সে মাতাল থাকে।' [৭]

আবু উমর হাফ্স ইয়াজিদ সম্পর্কে বলেছেন, 'খোদার শপথ, আমি ইয়াজিদ ইবনে মুয়াবিয়াকে মাতাল অবস্থায় নামাজ ত্যাগ করতে দেখেছি।'[৮]

ইয়াজিদের তিন বছরের রাজত্বরালে তিনটি ভয়ঙ্কার অপরাধ ঃ

(ক) কারবালার ঘটনা ঃ মহানবী (সঃ)-এর দৌহিত্র ইমাম হুসাইন (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নির্মম হত্যকান্ড এবং তাদের পরিবার পরিজনদেরকে বন্দী করা।

(খ) হার্‌রার ঘটনা ঃ পবিত্র মদীনা আক্রমণ এবং তিন দিনের জন্য মদীনা নগরীকে ইয়াজিদ সেনাবাহিনীর জন্য হালাল ও মুবাহ্ করে দেয়া হয়। যার ফরে ইয়াজিদের সেনাবাহিনী মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র মাজারের পাশে এই তিন দিন ধরে ইতিহাসের ভয়নক অপরারাধ সমূহ সংঘটিত করেছে। মদীনায় তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছিল এবং কোন কুমারী মেয়ে ইয়াজিদের সেনাবাহিনীর পাশবিক যৌন নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। মদীনা নগরীর কোন বসতবাড়িই তাদেও আক্রোমণের হাত থেকে অক্ষত থাকেনি। এ ঘটনায় ৩৬০ জন আনসার ও মুহাজির সাহাবী শাহাদত বরণ করেছিলেন।

মহা নবী (সঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ যারা মদীনাবাসীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে , মহান আলাহ তাদেকে ভীতসন্ত্রস্ত করবেন এবং তাদের উপর বর্ষিত হবে মহান প্রভুর সকল ফেরেশতা ও মানব জাতির অভিসম্পাত ।[১০]

(গ) মক্কা আক্রোমণ ঃ আব্দুলাহ ইবনে জুবাইরকে দমন করার জন্য ইয়াজিদ মক্কাভিমুখে সেনাবাহিনী পাঠায়। তারা মক্কা আক্রোমণ করে প্রস্তর ও মিনজানিক দিয়ে আগুন গোলা নিক্ষেপ করে কা'বা গৃহের ছাদ ও দেয়ালের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল ।[১১]

এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াজিদ ছিল দুশ্চরিত্র, লম্পট, কাফির এবং ইসলামী প্রশাসনের জন্য সম্পূর্ণ এক অযোগ্য ব্যক্তি। এদতসত্তেও মুয়াবিয়া তার এ কুলঙ্কার অযোগ্য পুত্রকে জোর করে মুসলিম উম্মাহর খলিফা মনোনীত করেছিল। আর এভাবেই ইসলামের ইতিহাসে ঘৃণ্য উমাইয়্যা রাজতন্ত্রের গোড়া পত্তন করে এবং মহানবী (সঃ) -এর প্রবর্তিত ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তে মুসলিম বিশ্বে রাজতন্ত্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ইয়াজিদ খলিফা হওয়ার পরপরই মুসলিম উম্মাহর জিবন যাত্রা থেকে ইসলাম ধর্মকে সম্পূর্ণ রূপে উচ্ছেদ করার অপচেষ্টা ও ষড়যন্ত্র চরম আকার ধারণ করে। যাতে ইয়াজিদ ও বনু উমাইয়ার এ চক্রন্ত সফল হয় সেজন্য ইয়াজিদ খেলাফতের মসনদে বসেই মদীনার গর্ভনরকে বল প্রয়োগ করে ইমাম হুসাইন (আঃ) থেকে বাইয়াত গ্রহণের নির্দেশ দেয়। ইমাম হুসাইন (আঃ) ইয়াজিদ ও বনু উমাইয়ার দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের অনুমোদন এবং ইসলাম, কুরআন ও মহানবী (সঃ)-এর পবিত্র সুন্নাহকে জলাঞ্জিলি দেয়। তাই তিনি পূর্ণ সাহসিকতার সাথে ইয়াজিদের আনুগত্য ও বাইয়াতকে প্রত্যাখ্যান করে ইয়াজিদ ও তার প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন এবং আন্দোলন ও বিল্পবের পথ বেছে নেন ।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বলেছিলেন ঃ

وَ عَلىالإِسلامِ السلام إذ قد بليت الأُمَّةُ براعٍ مثلِ يَزِيد

'যখন যখন জাতি ইয়াজিদের মত কোন শাসকের খপ্পড়ে পতিত হবে তখন ইসলামকে বিদায় সম্ভাষণসূচক সালাম জানতে হবে' ।

(২) কুফাবাসীদের দাওয়াত প্রসঙ্গ

মদীনার গর্ভনরের কাছে ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত করা প্রত্যাখ্যানের তিন দিন পর ইমাম হুসাইন (আঃ) সপরিবারে মহান বিপবকে সফল করা জন্য মদীনা ত্যাগ করে মদীনায় চলে আসেন। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মক্কায় আগত মুসলমানগণ ও মক্কাবাসীদের নিকট তিনি তাঁর বৈপ-বিক আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ইয়াজিদ ও বনু উমাইয়ার প্রকৃত চেহারা তুলে ধরেন। এ সময় তিনি কুফাবাসীদের থেকে অসংখ্য আমন্ত্রণ পত্র পান । কুফা ছিল তখন জনবহুল এবং সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী শহর। এ শহরটি দ্বিতীয় খলিফার যুগে প্রতিষ্ঠিত হয।

হযরত আলী ও হাসান (আঃ)-এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা মূলক আচারণেরই ফলশ্রুতিতে যখন উমাইয়া কুশাসন কুফাবাসীদের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসল তখনই তাদের বোধোদয় হল। তারা এ অবস্থার অবসান ঘটাতে চেয়ে ছিল। তাই যখন তারা শুনতে পেল যে, ইমাম হুসাইন (আঃ) ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত না করে মক্কায় চলে এসেছেন তখন তারা আরো উৎসাহী হল। তারা পত্রের পর পত্র পাঠিয়ে ইমাম হুসাইন (আঃ) -কে কুফায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং বল যে, তাঁর নেতৃত্বে ইয়াজিদী শাসনের নাগপাশ থেকে কুফা মুক্ত করে আবার সেখানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে । পরবর্তী পর্যায়ে তারা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে ইয়াজিদ ও বনু উমাইয়ার শাসন থেকে মুক্ত করে সেখানে প্রকৃত ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করবে । ইতিহাসে উলেখ করা হযেছে কুফাবাসীদের পক্ষ থেকে বার হাজারের অধিক পত্র আমামের কাছে এসে পৌছায়। নিঃসন্দেহে এ বিষয়টি ছিল জনতার পক্ষ থেকে এক মহা আহ্বান যা সত্যিকার জনদরদী, সত্যাশ্রয়ী কোন নেতার পক্ষে উপেক্ষ করা অশোভনীয় ও অনুচিত হয়ে দাঁড়ায়। তাই ইমাম হুসাইন (আঃ) তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিলেন তবে যথাযথ সতর্কতাও অবলম্বন করলেন । কারণ তিনি কুফাবাসীদের কোমলমতিতা, অস্থির চিত্ততা ও বিশ্বাস ঘাতকতা সম্পর্কে বেশ ভাল ভাবেই জ্ঞাত ছিলেন। এ জন্য তিনি পিত্রব্য পুত্র মুসলিম ইবনে আকীলকে তাঁর প্রতিনিধি স্বরুপ কুফায় পাঠালেন। মুসলিম ইবনে আকীল যখন কুফার সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ইমামের কাছে ইতিবাচক বিবরণ পাঠিয়ে তাঁকে কুফায় আসার আমন্ত্রণ জানালেন তখনই ইমাম হুসাইন (আঃ) কুফায় যাওয়ার ও সেখানকার অধিবাসীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে কুফা থেকে তাঁর আন্দোলন ও বৈপবিক কর্মকান্ড পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

এদিকে ইয়াজিদের গুপ্তঘাতকদের আনাগোনা ও মক্কায় হজ্ব চলাকালীন সময় তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা যখন ইমাম হুসাইন (আঃ) জানতে পারলেন তখন তিনি হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করে কুফাভিমুখে সপরিবারে যাত্রা করেন। কারণ তিনি ভাল করেই বুঝতে পেরে ছিলেন যে, ইয়াজিদের হাতে বাইয়াত না করে যেখানেই তিনি যান না কেন ইয়াজিদের গুপ্ত ঘাতকবাহিনী তাঁর পিছু ছাড়বে না এবং তাঁকে হত্যা করবেই। তিনি যদি ইয়াজিদের গুপ্ত ঘাতকদের হাতে প্রাণ হারান তাহলে তাঁর এভাবে নিহত হওয়ায় বনু উমাইয়া ও ইয়াজিদের কোন ক্ষতি তো হবেই না বরং তারা এ থেকে লাভবান ও উপকৃত হবে এবং মুসলিম উম্মাহও ইমাম হুসাইন (আঃ)-এর নিহত হওয়ার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না ।ফলে ইমাম হুসাইন (আঃ) যে বিপব ও আন্দোলনের দিকে সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং এর ফলে ইসলাম ধর্ম চরম হুমকীর সম্মুখীন হবে ।

আমরা কারবালার ইতিহাসে দেখতে পাই ইমামের কুফায় যাওয়ার প্রাক্কালে অনেক শুভাকাঙ্খীর কুফায় না যাওয়ার উপদেশ, মক্কায় থাকা বা মক্কা ছেড়ে অন্য কোন সুরক্ষিত নিরাপদ এলাকা বা

জনপদ যেমন ইয়ামেনে আশ্রয় নেয়া বা কুফা্য় যেতে হলে সপরিবারে না গিয়ে একাকী যাওয়ার সকল পরামর্শ তিনি বিনম্রভাবে প্রত্যাখান করেন। তিনি যদি কুফাবাসীদের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে মক্কায় থেকে যেতেন বা অন্যত্র যেমন ইয়ামেনে চলে যেতেন তাহলে পরবর্তী কালে যে সকল ঐতিহাসিক তাঁর কুফা গমনকে অদূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন তারাই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করে বলত:'তিনি কেন কুফাবাসীদের আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন না ? যদিও কুফাবাসীরা বিশ্বাসঘাতক ও চঞ্চলমতি ছিল তারপরও যদি তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কুফায় যেতেন তাহলে হয়তবা কুফাবাসীরা এ দফায় তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করত না এবং তাঁর নেতৃত্বে আন্দোলনে অংশ নিয়ে স্বৈরাচারী ইয়াজিদী-উমাইয়া শাসককে উৎখাত করে ইসলামী শাসন ব্যস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারত। অথচ ইমাম এ সম্ভাবনাময় গণজাগরণের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না !" এভাবে তাঁকে দোষারোপ করা হত এবং আন্দোলন ও নীতি-অবস্থানের সমালোচনা ও অবমূল্যায়ন করা হত। যদি কুফাবাসীদের এ আহ্বান আ আমন্ত্রণ না থাকত্‌ তাহলে তিনি হয়ত অন্য স্থানে চলে যেতেন এবং সেখান থেকে আন্দোলন চালিয়ে যেতেন। কুফাবাসীদের আহ্বানের কারণে তিনি কুফাকে তাঁর আন্দোলন ও কর্মতৎপরতা পরিচালনার কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিলেন। কুফার ভৌগলিক গুরুত্ব এবং দামেস্ককে মোকাবেলা করার ক্ষমতা সম্পর্কে আমাম পূর্ব থেকেই অবগত ছিলেন। তাই ইমামের সপরিবারে কুফা গমন অতি বাস্তব ও সম্পূর্ণ সময়োপযোগী পদক্ষেপ, তা কোন রাজনৈতিক ভুল বা অদুরদর্শিতা মূলক ছিল না ।

(৩) সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

ইয়াজিদের বাইয়াত ও কুফাবাসীদের আমন্ত্রণ প্রসঙ্গে তাৎক্ষণিক ও সাময়িক গুরুত্ব থাকলেও এদুটির কোনটিই ইমাম হুসাইন (আঃ) -এর আন্দোলনের মূল উপাদান বা লক্ষ্য ছিল না। বরং এ আন্দোলনের মূল উপাদান ও মূল কারণ ছিল, আল-আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা ।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ইসলাম ও ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্রেও মুল জীবনশক্তি। মুসলিম উম্মার ঐক্য রক্ষা (যা সর্বশেষ্ঠ সৎকাজ) বিচ্যুতির হাত থেকে উম্মাহ, ইসলাম ও ইসলামী সমাজকে সংরক্ষণ, ইসলামী বিধি-বিধান বা শরীয়তের সফল ও সঠিক প্রয়োগের নিশ্চয়তা, শিরক্‌ ,কুফরী ও সকল প্রকার অন্যায় অত্যাচার, অবিচার, দুষ্কর্ম ও দূর্নীতির উচ্ছেদ এবং মুসলিম উম্মাহ ও ইসলামী সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি কখনোই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ ব্যতীত সম্ভব নয়।

তাই সত্যিকার ইসলামী সমাজ বা রাষ্ট্র এ বিষয়টি অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও নিষেধ অবশ্যই যথাযথ ভাবে সজীব, প্রাণবন্ত ও বলবৎ থাকতে হবে। কোন মুমিন ব্যক্তি ব্যক্তিই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কাজটি যথাযথ আমল করা ব্যতীত ঈমান, নীনি-নৈতিকতা, খোদা-পরিচিতি ও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হওয়ার পূর্ব শর্তই হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করা ।

পবিত্র কুরআনে মহান প্রভু বলেন ঃ

كنتم خير أمّة أخرجت للنّاس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

'(হে মুসলমানগণ!) তোমরাই হলে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে । তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে ।

-সুরা আলে ইমরান ১১০ নম্বর আয়াত ।

و لتكن منكم أمة يدعون إلى لبخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و أولئك هم المفلحون

তোমাদের মধ্যে এমন একটি গোষ্ঠি থাকবে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে সৎকাজের আদেশ করবে ও অসৎ কাজের নিষেধ করবে এবং তারাই হবে সফলকাম ।

-সুরা আলে ইমরান ১০৪ নম্বর আয়াত ।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। আয়াতটিতে যে গোষ্ঠীর কথা বলা হয়েছে তাঁদেও মধ্যে যাবতীয় পূর্বশর্ত পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবে বা উপায়ে তাঁরা সমাজে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ করেন। আর পরিণামে এজাতিয় মহান ব্যক্তিরাই হবেন সফলকাম। তাঁরা যেমন নিজদেরকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যান ঠিক তেমনি ভাবে তাঁরা গোটা সমাজকেও সাফল্যের পথে নিয়ে যাবেন 'সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ'-এ মূলনীতিটি পালন করার মাধম্যে। উলেখিত শর্ত সমূহ পবিত্র সুরা তওবার ১১২ নম্বর আয়াতে উলেখিত হয়েছে। মহান প্রভু বলেন ঃ

التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنكر و الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنين

' তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, আলাহর প্রসংশাকারী, সিয়াম পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের বাধা দানকারী। মহান আলাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমাসমূহের হেফাজাতকারী একবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দাও।'

সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের বাধা দানকারী, আলোরকাজ্জ্বল চিন্তা, ঈমান ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের মাধ্যমে নিজেকে সংশোধন করে এবং এরপর সে সমাজের সংস্কার ও সংশোধনের কাজে আত্ম নিয়োগ করে । অর্থাৎ এক কথায় সে (সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজে বাধা দানকারী) একজন সমাজ সংস্কারক ও সংশোধক ।[১৪]

এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয যে, ইসলাম ও ইসলামী সমাজের অস্তিত্ব, অগ্রগতি ও বিকাশ নির্ভর করে এই 'আমর বিলমারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার'-এর উপর । অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, হুসাইনী আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ও কারণ ও মূল গাঠনিক উপাদানই হচ্ছে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা প্রদান। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অপর দু'টি কারণ (বাইয়াত ও আমন্ত্রণ) এ আন্দোলনের গৌণ উপাদান স্বরুপ ভুমিকা পালন করেছে। তাই এ কারণদ্বয় যদি বিদ্যমান না থাকত্ তারপরও ইমাম হুসাইন (আঃ) সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎকাজের বাধা বাধা প্রদান কারী হিসেবে অর্থাৎ একজন সংস্কারক ও সংশোধক হিসেবে আপাদমস্তক পাপ-পঙ্কিলতায় নিমিজ্জিত সমাজকে সংশোধন করার জন্য ইয়াজিদী প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবশ্য আন্দোলন করতেন। ইমাম হুসাইন (আঃ) নিজেই মহা নবী (সঃ)-এর সুন্নাহর অবমাননা ও বিদআতের প্রচলন সম্পর্কে বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন ঃ

انــى لم اخرج و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح فى امه جــدى (ص) اريــد ان آمــر بــالمعروف و انهى عن المنكــر و اسيــر بسيــره جــــدى و ابى على بن ابيطالب.

" আমি আপনাদেরকে আল-কুরআন ও মহানবীর সুন্নাহর দিকে ফিরে আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি । কারণ নবীর পবিত্র সুন্নাহর ধ্বংস-সাধন করা হয়েছে এবং বিদআতের পুনরুজ্জীবন, প্রচার ও প্রচলন করা হয়েছে ।"

মুসলিম ইবনে আকিলকে কুফায় পাঠানোর সময় কুফাবাসীদেও উদ্দেশ্যে প্রেরিত পত্রে ইমাম হুসাইন (আঃ) উলেখ করেন যে,

“ আমার জীবনের শপথ ইমাম কোন ব্যক্তি ? ইমাম সেই সেই , যে আলাহর কিতাব অনুযায়ী আমল করবে, সত্য-ন্যায়প্রতিষ্ঠা করে, সত্য ধর্মাবলম্বী, মহান আলাহর বিরুদ্ধাচারণ থেকে নিজকে সংযত ও বাঁচিয়ে রাখে ।”

ইমাম হুসাইন মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার কাছে লিখিত ওসিয়তে মক্কা থেকে কুফা পানে যাওয়ার লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উলেখ করে বলেছেনঃ ---------- “আমি প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে বা জালেম হিসেবে (মক্কা থেকে) বের হইনি। আমি তো বের হয়েছি আমার নানার উম্মতকে সংশোধন করার জন্যে । আমি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে চাই এবং আমি আমার নানা ও পিতা আলী ইবনে আবি তালিবের জীবন- পদ্ধতির (সীরাত) উপর চলতে চাই। অতএব, যে কেউ সত্য গ্রহন করার মত আমাকে গ্রহন করবে মহান আল-াহই হচ্ছেন সত্যিকার ভাবে আমার ও তার জন্যে সবচেয়ে উত্তম। আর যদি কেউ এ ব্যাপারে আমাকে প্রত্যাখান করে তাহলে আমি ধৈয্য ধারন করব (ধৈয্যের সাথে আমি একাই আমার দায়িত্ব পালন করব অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করব)।

কুফার পথে হুর ইবনে ইয়াজিদ রিয়াহীর সেনাবাহিনীর সাথে মুখোমুখি হওয়ার সময় এক ভাষণে ইমাম হুসাইন (আঃ) বলেছিলেনঃ

‘‘ হে লোক সকল,মহানবী (সাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন অত্যাচারী , আলাহর হারামকে হালালকারী (বৈধ), প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী এবং রসুলের সুন্নাহ বিরোধী কোন শাসককে প্রত্যক্ষ করবে যে আলাহর বান্দাদের মাঝে পাপাচার করে এবং আলাহর সাথে শক্রুতা মুলক মনোবৃত্তি পোষন করে , সে যদি কথা বা কাজের দ্বারা ঐ শাসককে বাধা না দেয় তাহলে ঐ ব্যক্তিকে জাহান্নামে ঐ শাসকের ঠিকানায় প্রবেশ করানো মহান আলাহর জন্য হক বা অধিকার হয়ে যাবে।

সাবধান! সাবধান! এরা শয়তানের আনুগত্য ওয়াজিব করে নিয়েছে । মহান আলাহর আনুগত্য থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে , প্রকাশ্যে ফ্যাসাদ ও দুর্নীনিতে লিপ্ত , মহান প্রভুর দন্ডবিধি বাতিল করেছে। আলাহর হারামকে হালাল এবং তাঁর হালালকে হারাম করেছে । আর আমি রাসুলের সাথে আমার নিকট আত্মীয়তার কারণে এ খেলাফতের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ।”

তিনি হুর ইবনে ইয়াজীদ রিয়াহীর সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অপর এক বতৃতায় বলেছিলেন ঃ ‘হে লোক সকল , তোমারা যদি মহান আলাহকে ভয় কর এবং হক বা অধিকারের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের হক বা অধিকার চিনতে পার তাহলে তা হবে তোমাদের জন্য আলাহর সন্তুষ্টি লাভের উপায় স্বরুপ। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আহলে বাইত । এ খেলাফতের জন্য সর্বাধিক হকদার। খেলাফতের এ সকল মিথ্যা দাবীদার থেকে তোমাদের উচিত পৃথক পৃথক হয়ে যাওয়া। তাদের কোন অধিকারই নেই। তারা তোমাদের সাথে অত্যাচার ও শক্রুতায় লিপ্ত ”।

ইমাম হুসাইন (আঃ) তাঁর এ সকল ভাষণে আপন আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং অন্তর্নিহীত বাণী সম্পর্কে চমৎকার ভাবে জনগণকে অবহিত করেন। মুসলিম উম্মাহর সংশোধন ও সংস্কার এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইমাম হুসাইন তাঁর নিজের ও সঙ্গী-সাথীদের জীবন এর জন্য উৎসর্গ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি । সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের বাধা দান করতে গিয়ে পুণ্যাত্মা হুসাইন (আঃ)-ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের জীবনও যদি উৎসর্গ করতে হয় এবং এর ফলে যদি ইসলাম ধর্ম বিকৃতি ও বিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা পায় তাহলে সেটিই হবে কাম্য ও ফরজ (অবশ্যকরণীয়)। তাই ইমাম হুসাইন (আঃ) পাপিষ্ঠ ইয়াজিদ স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বিপব করে নিজ ও সঙ্গী-সাথীদের জীবন উৎসর্গ করে মহান ইসলামকে রক্ষা ও সমুন্নত করে গেছেন।

তিনি হুর ইবনে ইয়াজিদের সেনাদলের সম্মুখে সমসাময়িক পরিস্থিতি, সরকার ও জনগণের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন ঃ

'তোমরা কি দেখতে পাও না যে, সত্যানুযায়ী কাজ করা হচ্ছে না এবং অসত্যকে বাধা দেয়া হচ্ছে না যাতে করে মুমিন তার প্রভুর সাথে সত্যি সত্যি সাক্ষাৎ করতে উদ্বুদ্ধ না হয়। অতএব, এহেন পরিস্থিতিতে আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য ছাড়া আর কিছুই ভাবি না এবং অত্যাচারী-জালিমদের সাথে জীবন যাপনকে অপমানকর ও গানিময় মনে করি ।'

আশুরা পালনের প্রধান লক্ষ্য হল, তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধন করা। এলক্ষ্য বাস্তবায়নের মধ্যেই ইমামের আদর্শ ও কারবালার শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা ও সফলতা নিহিত রয়েছে ।

তথ্যসূত্র

১. আলামা ইবনে হাজার আসকালানী প্রণীত তাহ্যীবুত্ তাহযীব ঃ আল- হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবি তালিব সংক্রান্ত বিবারণ, পৃঃ নম্বর ৩৪৫-৩৪৯ ।

২. জামে আত্-তিরমিজী, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নম্বর ৩৬৬২, পৃঃ ৩২৬, বাংলাদেশ ইসলামীক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত ।

৩. মুরুজুজ জিহাব, ২য়খন্ড, পৃঃ ৪২৭ ।

৪. তারীখুল ইয়াকুবী, ২য় খন্ড পৃঃ নম্বর ১৫৮ ও ১৫৯; মুরুজুজ জিহাব, ২য় খন্ড, পৃঃ নম্বর ৫৬ । তারীখে ইবনে আসাকির, ৫ম খন্ড, পৃঃ নম্বর ৪০৯। ইবনে আসীরের আল কামিল ফীত্ তারীখ, ৩য় খন্ড, পৃঃ নম্বর ১৯২ ।

৫. তারীখে ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃঃ-১৩৬। আহকামুস্ সুলতানীয়া পৃঃ নম্বর ২১৯।

৬. হায়াতুল ইমাম আল-হুসাইন, ২য় খন্ড, পৃঃ নম্বর ২৫৫।

৭. আল-বিদায়াহ্ ওয়া আন্ -নিহায়াহ্ ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১৬ এবং ইবনে আসীর প্রণীত আল-কামেল ফীত্ তারীখ, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ট নম্বর ৪৫।

৮. আল-বিদায়াহ্ ওয়া আন্ -নিহায়াহ্ ৮ম খন্ড, পৃঃ ২১৬ । ইবনে আসীর প্রণীত আল-কামেল ফীত্ তারীখ, ৪র্থ খন্ড পৃষ্ট নম্বর ৪৫।

৯. তাতিম্মাতুল মুনতাহা, পৃঃ নম্বর ১৩ ।

১০. সহীহ্ মুসলিম ।

১১. তারীখে ইবনে আসাকির, ৭ম খন্ড, পৃঃ ৩৭২ । আলামা সুয়ূতী প্রণীত তারীখুল খুলাফা গ্রন্থের ২০৫ পৃষ্ঠায় হয়েছে । আল-ওয়াকিদী আব্দুলাহ বিন হানযালাহ্ আল্-গাসীলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আব্দুলাহ বিন হানযালা বলেছেন ঃ খোদার শপথ, আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ হওয়ার ভয় আমাদের সাথে যিনা করে , সে মদ্যপায়ীদেও বিরুদ্ধে কখনো বিদ্রোহ করিনি । সে মাতা, কন্যা এবং ভগ্নিদের সাথে যিনা করে , সে মদ্যপায়ী এবং নামায তরককারী।

১২.সুরা আলে ইমরান, ১১০ নম্বর আয়াত ।

১৩. সুরা আলে ইমরান, ১০৪ নম্বর আয়াত ।

১৪.আয়াঃ মুতাহারী প্রণীত হামাসায়ে হুসাইনী